মৌর্য আমলের শিল্পচর্চা

হরপ্পা সভ্যতার পর ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য আমলেরই শিল্পের উদাহরণ পাওয়া যায়। মৌর্য শিল্পে পাথরের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছিল। ঐ শিল্পের বেশিরভাগ নিদর্শন ভাস্কর্য, স্থাপত্যের নজির খুব অল্প।

অশোক ও তার পরবর্তী মৌর্য সম্রাটরা আজীবিকদের জন্য *গুহাবাস* বানিয়ে দিয়েছিলেন। পাহাড় কেটে কৃত্রিম গুহা বানানো হতো। সেই গুহাগুলির ভিতরে মানুষ বাস করত বলে তাকে গুহাবাস বলা হতো। জানা যায় সম্রাট অশোক অনেকগুলি স্তূপ বানিয়ে দিয়েছিলেন বৌদ্ধদের জন্য। শুরুর দিকে স্তূপগুলি মাটির তৈরি হতো। অশোকের সময় অনেক স্তূপের উপর ইটের ব্যবহার শুরু হয়। ফলে স্তূপগুলি অনেক বেশি মজবুত ও স্থায়ী হয়েছিল। অশোকের আমলেই সারনাথ ও সাঁচীর স্তূপগুলি ফের বানানো হয়।

ছবি. ৮.৩ : ধামেক স্তূপ, সারনাথ

স্তূপের বিবর্তন : মৌর্য থেকে কুষাণ যুগ

নীচের স্তূপগুলি ভালো করে খেয়াল করো। সেগুলির মধ্যে কী কী মিল ও অমিল দেখতে পাচ্ছো, তা লেখো।

মৌর্য আমলের স্তূপ

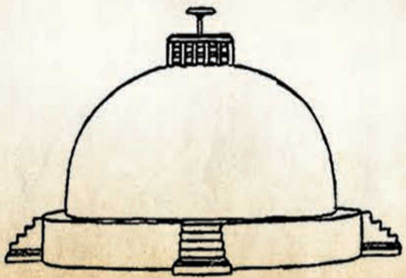

ইন্দো-গ্রিক আমলের স্তূপ

কুষাণ আমলের স্তূপ

ছবি. ৮.৪:
অশোকস্তম্ভ, সারনাথ

মৌর্য শিল্পের অন্যতম নজির অশোকের আমলে বানানো পাথরের স্তম্ভগুলি। স্তম্ভগুলির গায়ে কখনো কখনো লেখ খোদাই করা হতো। একটি পাথর থেকেই স্তম্ভগুলি তৈরি হতো। অশোকস্তম্ভ অনেকটা চক-খড়ির মতো দেখতে। স্তম্ভের ভিত মাটিতে পোঁতা থাকত। কোনো ঠেকা ছাড়াই স্তম্ভগুলো সোজা দাঁড়িয়ে থাকত। একটা মাত্র পাথর কেটেই তৈরি হতো বলে স্তম্ভগুলোকে মূলত ভাস্কর্য বলা যেতে পারে। স্তম্ভের একেবারে ওপরে বসানো থাকত একটা প্রাণীর মূর্তি। সিংহ, হাতি, ষাঁড় প্রভৃতি প্রাণীর মূর্তি সেক্ষেত্রে ব্যবহার হতো। এই জাতীয় পাথরের স্তম্ভ মৌর্য যুগের আগে দেখা যায়নি। এমনই একটি বিখ্যাত অশোকস্তম্ভ সারনাথে রয়েছে।

মৌর্য যুগের শিল্পে মানুষের মূর্তি বিশেষ দেখা যায়নি। মৌর্য শিল্প মূলত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়েছিল। জনসাধারণের জীবন যাপনের সঙ্গে মৌর্য শিল্পের বিশেষ যোগ ছিল না। তাই মৌর্য শিল্পের ছাপ পরবর্তী সময়ের শিল্পে বিশেষ দেখা যায় না।

ছবি. ৮.৪:
অশোকস্তম্ভ, রামপূর্বা

সুঙ্গ-কুষাণ-সাতবাহন আমলে শিল্পচর্চা

মৌর্যদের পরবর্তী যুগে ভাস্কর্য বানানোর কাজে পাথরের পাশাপাশি পোড়ামাটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ফলে সেই সময় শিল্পচর্চা পুরোপুরি শাসকের অনুগ্রহের উপরে নির্ভরশীল ছিল না। সুঙ্গ, কুষাণ ও সাতবাহন আমলে সাধারণ জীবনের ছাপ শিল্পের উপর পড়েছিল। তবে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গেও শিল্পের যোগাযোগ ছিল। এই সময় ধর্মীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সেরা নজির স্তূপ, চৈত্য ও বিহার। প্রধানত বৌদ্ধধর্মচর্চার সঙ্গেই এই স্থাপত্য শিল্পগুলি জড়িত। তবে জৈন ধর্মেও স্তূপ বানানোর নজির রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্থাপত্যের নজির এই আমলে খুবই সামান্য।

সুঙ্গ-কুষাণ যুগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাস্কর্যের বিষয় ছিল বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধ ধর্ম। এই আমলের শিল্পে রাজদরবারের সরাসরি প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। তবে প্রকৃতি এবং রোজকার জীবনের নানা দিক ভাস্কর্য শিল্পে ফুটে উঠেছে। তোরণের ভাস্কর্যগুলি অনেক সময় যেন একটি টানা গল্প বলে চলেছে।

শক-কুষাণ যুগে গন্ধার ও মথুরার শিল্পরীতি ছিল খুব বিখ্যাত। বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধ ধর্ম এই দুই শিল্পরীতির মূল বিষয়। গন্ধার ভাস্কর্যে প্রধানত গ্রিক ও রোমান প্রভাব দেখা যায়। মথুরা রীতির ভাস্কর্যে লাল চুনাপাথরের বেশি ব্যবহার হতো।

ছবি. ৮.৬: সুঙ্গ আমলের পোড়ামাটির ভাস্কর্য, চন্দ্রকেতুগড়

ছবি. ৮.৭: ভারহুতের ভাস্কর্য

ছবি. ৮.৮: গৌতম বুদ্ধ, মথুরা শৈলী

ছবি. ৮.৯: অমরাবতীর ভাস্কর্য

ছবি. ৮.১০: গৌতম বুদ্ধের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য, গন্ধার ভাস্কর্য

টুকরো কথা

স্তূপ-চৈত্য-বিহার

জানা যায়, গৌতম বুদ্ধ তাঁর দেহাবশেষের উপর **স্তূপ** বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্ধ-গোলাকার মাটির ঢিবিগুলোই ছিল মৌর্য যুগের আগের স্তূপ। মৌর্য পরবর্তী সময়ে স্তূপ বানানো সংখ্যায় অনেক

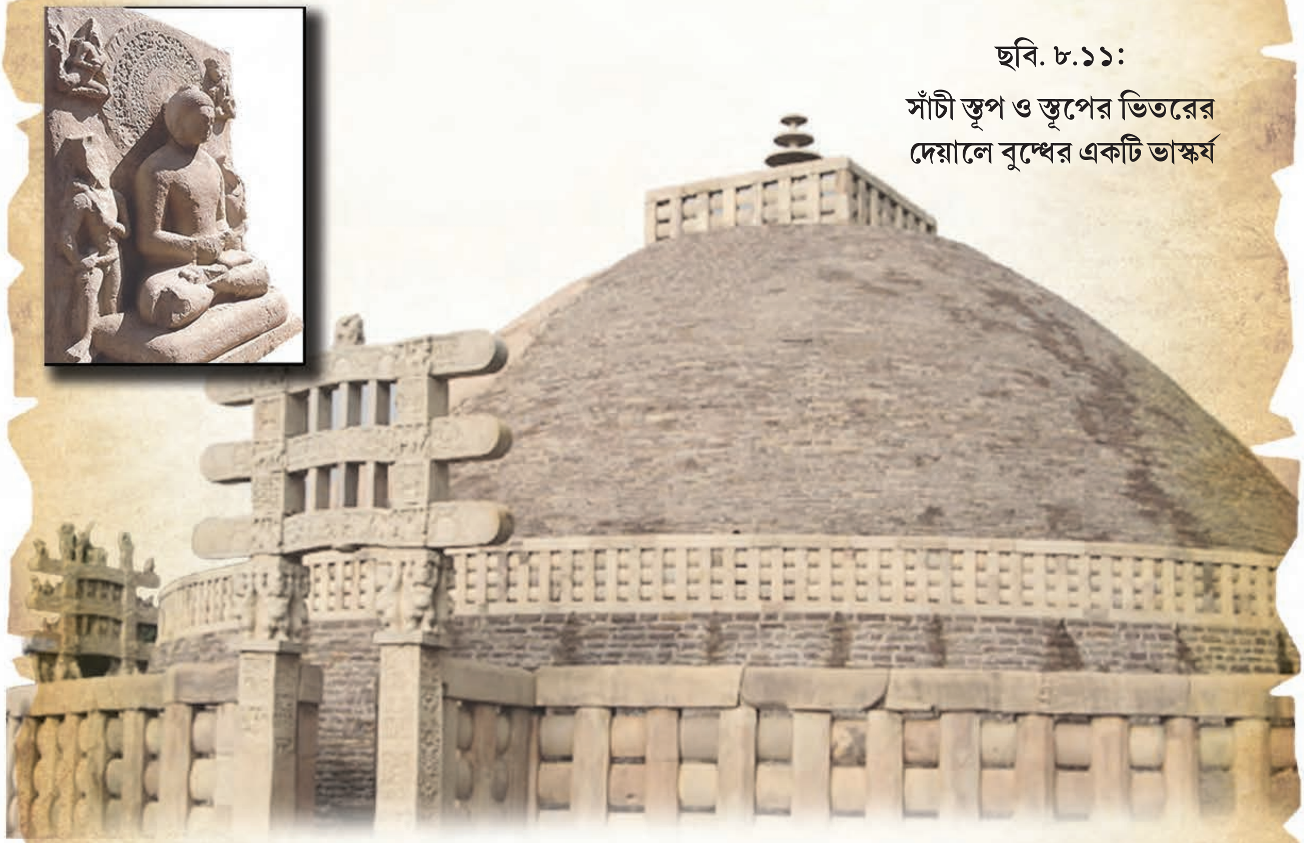

ছবি. ৮.১১:
সাঁচী স্তূপ ও স্তূপের ভিতরের দেয়ালে বুদ্ধের একটি ভাস্কর্য

বেড়ে যায়। স্তূপের চারদিকে চারটি বড়ো দরজা থাকত। সেগুলিকে **তোরণ** বলা হয়। তোরণগুলিতে ভাস্কর্য খোদাই করা হতো। স্তূপের চারপাশে ঘুরে ঘুরে উপাসনা করার জন্য পথও থাকত। শাসক ও ধনী ব্যক্তিদের উদ্যোগে স্তূপগুলি তৈরি হতো। ভারহুত, সাঁচী ও অমরাবতীর স্তূপগুলি স্থাপত্য হিসাবে বিখ্যাত।

স্তূপের সঙ্গে সঙ্গে বানানো হতো **চৈত্য**। সরাসরি পাহাড় কেটে গুহাবাস হিসাবেই বেশিরভাগ চৈত্য বানানো হতো। চৈত্যের আকার হতো লম্বাটে ধরনের। চৈত্যের শেষ প্রান্তে উপাসনার জন্য একটি স্তূপ থাকত। সাতবাহন যুগে নাসিক, পিতলখোরা, কার্লে প্রভৃতি অঞ্চলে চৈত্য বানানো হয়েছিল।

বৌদ্ধ বিহার বা সংঘারামগুলিও স্থাপত্য শিল্পের উদাহরণ। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকার ও পড়াশোনার জন্যই বিহারগুলি তৈরি হতো। বিহারগুলি আদতে ছিল অনেকগুলি গুহার সমষ্টি। পরবর্তীকালে ইট দিয়ে বিহার তৈরি করা হতো।

ছবি. ৮.১২:
অজন্তার চৈত্য গুহা

ছবি. ৮.১৩:
নালন্দা মহাবিহারে
সারিপুত্ত স্তূপ

গুপ্ত ও পল্লব আমলের শিল্প চর্চা

গুপ্ত আমলেও শিল্পচর্চার সঙ্গে ধর্মীয় ধ্যানধারণার যোগাযোগ দেখা যায়। পাথরের পাশাপাশি পোড়ামাটির ব্যবহারও এইসময় ভাস্কর্যে লক্ষ করা যায়।

স্তূপ ও চৈত্য বানানো গুপ্ত আমলেও চালু ছিল। সারনাথের ধামেক স্তূপ প্রথমে ইট দিয়ে বানানো হয়েছিল। এই আমলে তার উপরে পাথরের আস্তরণ দেওয়া হয়। গুপ্ত আমলে প্রথম স্থাপত্য হিসাবে মন্দির বানানো শুরু হয়। মন্দির কখনো ইট কখনো পাথর দিয়ে তৈরি হতো। এই আমলের মন্দিরগুলির মধ্যে দেওঘরের দশাবতার মন্দির বিখ্যাত। পাশাপাশি পাহাড় ও পাথর কেটে মন্দির তৈরির চল ছিল। পল্লব আমলে মহাবলীপুরমে পাথর কেটে রথের মতো দেখতে মন্দির তৈরি হয়েছিল। গুপ্তযুগের শিল্পের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ খুব স্পষ্ট।

গুপ্তযুগ ও পল্লবযুগের মন্দিরগুলির দেয়ালে নানা দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল। যেমন কৈলাস মন্দিরে রামায়ণের প্যানেল, দশাবতার মন্দিরের ভাস্কর্য। গুপ্তযুগের চিত্রশিল্পের সবথেকে বিখ্যাত উদাহরণ মধ্য ভারতে অজন্তা গুহার ছবিগুলি। বিভিন্ন গাছপালা ও মানুষের ছবি সেখানে রয়েছে। নানাধরনের অজন্তা গুহার ছবিগুলিতে দেখা যায়। রংগুলি বিভিন্ন পাথর, মাটি ও গাছ-গাছড়ার উপাদান দিয়ে তৈরি করা হতো। অজন্তা ছাড়াও ইলোরা এবং বাঘ গুহাতে বেশ কিছু ছবি পাওয়া গেছে।

ছবি. ৮.১৪:
দশাবতার মন্দির, দেওঘর

ছবি.৮.১৫: বৌদ্ধ ভিক্ষু, অজন্তা গুহাচিত্র

ছবি.৮.১৬: ইলোরা গুহাচিত্র

টুকরো কথা
চন্দ্রকেতুগড়

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেড়াচাঁপায় পাওয়া গেছে প্রাচীন বাংলার প্রত্নস্থল চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ। চন্দ্রকেতুগড় বিদ্যাধরী নদীর মাধ্যমে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটি ছিল একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। আবার অন্যদিকে ছিল সমৃদ্ধ জনপদ। এখানে মৌর্য আমলের আগে থেকে (আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৬০০-৩০০ খ্রিঃ পূঃ অব্দ) পাল-সেন আমল পর্যন্ত (আনুমানিক ৭৫০-১২৫০ খ্রিঃ অব্দ) সময় কালের নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেমন নানা ধরনের মাটির পাত্র, সিলমোহর, মূর্তি প্রভৃতি। এখানে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির তৈরি মূর্তি পাওয়া গেছে। যার মধ্যে নারীমূর্তির সংখ্যা বেশি।

ছবি.৮.১৭: পোড়ামাটির ভাস্কর্য, চন্দ্রকেতুগড়

ছবি. ৮.১৯: সুঙ্গ আমলের রাজপরিবার, টেরাকোটা, বাংলা, খ্রিস্টীয় প্রথম শতক

ছবি. ৮.১৮ ও ৮.২০: সাঁচী স্তূপের পূর্বদিকের তোরণের গায়ের ভাস্কর্য

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো :

১.১) নালন্দা, তক্ষশিলা, বলভী, পাটলিপুত্র।

১.২) ব্রাহ্মী, সংস্কৃত, খরোষ্ঠি, দেবনাগরী

১.৩) রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিকম, অর্থশাস্ত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তলম।

২। নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখো :

২.১) নালন্দা মহাবিহারে কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই পড়তে পারত।

২.২) কম্বনের রামায়ণে রামকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

২.৩) বাগভট ছিলেন একজন চিকিৎসক।

২.৪) কুষাণ আমলে গন্ধার শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।

৩। ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
মহাবলীপুরম	কুষাণ যুগ
গন্ধার শিল্পরীতি	নাগার্জুন
গণিতবিদ	তামিল মহাকাব্য
মণিমেখলাই	গুহাচিত্র
অজন্তা	রথের মতো মন্দির

৪। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

৪.১) প্রাচীনকালের বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আজকের শিক্ষাব্যবস্থার মিল-অমিলগুলি নিজের ভাষায় লেখো।

৪.২) চরক সংহিতায় আদর্শ হাসপাতাল কেমন হবে, তা বলা আছে। তোমার মতে একটি ভালো হাসপাতাল কেমন হওয়া উচিত?

৪.৩) একটি বিহার ও স্তূপের মধ্যে পার্থক্যগুলি লেখো।

৫। হাতেকলমে করো :

মাটি/থার্মোকল দিয়ে চৈত্য/বিহার/স্তূপের মডেল তৈরি করো।

৯ ভারত ও সমকালীন বহির্বিশ্ব

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত

রুবির বাড়ি যেতে সবাই সবসময় রাজি। রুবির দাদু এতরকম গল্প বলেন। মজার মজার খেলা শেখান। কয়েকদিন ধরেই দাদু ওদের নিয়ে একটা মজার খেলা খেলছেন। একটা ইয়া বড়ো পৃথিবীর

মানচিত্র মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হয়। তাতে কত জায়গার নাম। তার সঙ্গে নদী-পাহাড় সব কিছু। এবারে সবাই কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে যায়। তারপর একদল অন্যদলকে একটা নাম বলে। যেটা খুঁজতে হয় মানচিত্রে। পারলে পয়েন্ট পাওয়া যায়। না পারলে পয়েন্ট কাটা যায়। এভাবে চলতে থাকে খেলা। সবাই মশগুল হয়ে খেলে। আর খেলার শেষে বোঝে কত কিছু শেখা হলো, আবার খেলাও হলো।

একদিন খেলার মাঝে সুরাইয়া দাদুকে প্রশ্ন করল। আচ্ছা দাদু, এই যে মানচিত্রে এত দেশ, এসব কী প্রাচীন যুগে ছিল? দাদু বললেন, পৃথিবীর মানচিত্র বারবার বদলেছে। যে দেশগুলো এখনকার মানচিত্রে দেখছ প্রাচীন যুগে সেগুলো ছিল না। এখনকার অনেকগুলো দেশ বা অঞ্চল জুড়ে তৈরি হয়েছিল সে যুগের একেকটা সভ্যতা। সেই সভ্যতাগুলির মধ্যে যোগাযোগও ছিল। প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতাগুলির কথা তো জেনেছ। ঐ সময়ে পৃথিবীর নানা জায়গায় অন্যান্য সভ্যতার কথাও কিছুটা তোমাদের জানা। সেই সভ্যতাগুলির সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতাগুলির যোগাযোগ নানাভাবে গড়ে উঠেছিল।

পরদিন ইতিহাস ক্লাসে পলাশ দিদিমণিকে দাদুর কথাগুলো বলল। দিদিমণি বললেন, হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে ঐ সময়ের অন্যান্য সভ্যতার যোগাযোগের কথা আগেই জেনেছ। সেই যোগাযোগ তার পরবর্তী সময়েও ছিল। তবে যোগাযোগের নানা রকম দিক ছিল। এবারে দিদিমণি বোর্ডে একটা ছক আঁকলেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতাগুলির সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার যোগাযোগ ⇨

- বিদেশি জাতির আগমন
- রাজ্যজয় ও দূত বিনিময়
- ব্যবসাবাণিজ্য
- সাংস্কৃতিক যোগাযোগ
- ধর্মপ্রচার ও তীর্থযাত্রা
- পড়াশোনা

মানচিত্র.৯.১:
প্রাচীন বিশ্বের

প্রাচীন মেসোপটেমিয়া অঞ্চল ও সুমের, ব্যাবিলন প্রভৃতি সভ্যতা

প্রাচীন মিশর অঞ্চল ও মিশরীয় সভ্যতা

প্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্য

কয়েকটি সভ্যতা

প্রাচীন চিন সভ্যতা

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা

প্রাচীন রোমান সভ্যতা

টুকরো কথা
এক নজরে প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা

❒ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানের অঞ্চলকে গ্রিকরা বলতো **মেসোপটেমিয়া**। ঐ শব্দটির মানে দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। ❒ প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের একটা অংশে ছিল সুমেরীয় সভ্যতা। ❒ সুমেরের লিপিকে ইংরেজিতে বলে **কিউনিফর্ম**। ❒ সুমেরের লোকেরা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নানান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করত। ❒ সুমেরের লোকেরা প্রথম কাঠের চাকার ব্যবহার শুরু করেছিল। ❒ সুমের ছাড়াও মেসোপটেমিয়ার আরেকটি বিখ্যাত সভ্যতা হলো ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি প্রথম লিখিত আইন চালু করেছিলেন।

❍ উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় নীল নদের তীর বরাবর ছিল প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরকে বলেছিলেন **নীলনদের দান**। ❍ মিশরের শাসকদের **ফ্যারাও** বলা হতো। তাদের মৃতদেহ রাখার জন্য পিরামিড বানানো হতো। ❍ মিশরে প্যাপিরাস গাছের ছালে লেখা শুরু হয়। প্যাপিরাস থেকেই কাগজের ইংরেজি শব্দ পেপার এসেছে। ❍ বর্ণ ও ছবি মিলিয়ে মিশরে একরকম লেখার ব্যবহার হতো। তাকে মিশরীয় **হায়ারোগ্লিফ** লিপি বলা হয়। ❍ মিশরের ল্যাপিস লাজুলি পাথর ভারতীয় উপমহাদেশে আমদানি করা হতো।

❒ এশিয়া মহাদেশের পূর্বে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর অববাহিকায় ছিল প্রাচীন চিন সভ্যতা। ❒ প্রথম কাগজ বানানোর ও কাঠের হরফ বানিয়ে ছাপার কৌশলও চিনেই তৈরি হয়েছিল। ❒ বাইরের আক্রমণ ঠেকাতে চিনের শাসকরা পাঁচিল দিয়ে সাম্রাজ্য ঘিরে রেখেছিলেন। সেই বিরাট পাঁচিলগুলিকে একসঙ্গে চিনের প্রাচীর বলা হয়। ❒ চিনে বারুদের ব্যবহার হতো।

❍ পাহাড়ে ঘেরা গ্রিসে অনেকগুলি ছোটো ছোটো রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। সেগুলিকে বলা হতো নগর রাষ্ট্র বা পলিস। পলিসগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল এথেন্স ও স্পার্টা। তাদের সঙ্গে পারসিক সাম্রাজ্যের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধের কথা গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস-এর লেখায় পাওয়া যায়। ❍ এথেন্স ও স্পার্টা নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ করেছিল। গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিডাইডিস সেই যুদ্ধের কথা লিখেছিলেন। ❍ প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত ও নানান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হতো। পারসিক ও অন্যান্য সভ্যতার ছাপ গ্রিক সভ্যতায় পড়েছিল।

❒ পারস্য উপসাগরের উত্তরে গড়ে উঠেছিল বিরাট পারসিক সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পারসিক সংস্কৃতিও ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। ❒ কুরুষ ও প্রথম দরায়বৌষ ছিলেন দুজন বিখ্যাত পারসিক সম্রাট।

❍ ভূমধ্যসাগরের ইটালির উপকূল ঘিরে ছিল প্রাচীন রোমান সভ্যতা। ধীরে ধীরে রোমানরা বিরাট সাম্রাজ্য বানিয়েছিল। ❍ গ্রিসের ও অন্যান্য সভ্যতার ছাপ রোমের সভ্যতায় পড়েছিল। রোমে রাজনীতি, আইন, শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের নানা উন্নতি হয়েছিল। ❍ রোমের রাজকর্মচারীর আদেশেই জেরুজালেমে যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়।

এই সভ্যতাগুলির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

৯.১ ভারত ও বহির্বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্র খেয়াল করো। দেখবে যে, উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে বেশ কয়েকটি গিরিপথ। উত্তর-পশ্চিমের ঐ গিরিপথগুলি ধরেই পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে উপমহাদেশের যোগাযোগ ঘটত। অন্যদিকে হিমালয় পর্বতশ্রেণির গিরিপথ দিয়ে চিন ও তিব্বত-এর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় ছিল। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথের মধ্যে দিয়েই বিদেশিরা উপমহাদেশে এসেছে। ঐ পথ ধরেই বিদেশি রাজনৈতিক শক্তিগুলি উপমহাদেশে ক্ষমতা কায়েম করেছে। আবার পাশাপাশি ঐ পথ ধরে ব্যবসাবাণিজ্যও চলেছে। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও হয়েছে। তাছাড়া সমুদ্রপথেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় চলত।

৯.১.১ রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম

ভারতীয় উপমহাদেশে ইন্দো-ইরানীয়দের আগমন বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। ভৌগোলিক কারণেই উত্তর-পশ্চিম অংশের স্থলপথ দিয়েই বেশিরভাগ বিদেশিজাতি ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল পারসিকরা।

ভারতীয় উপমহাদেশ ও পারস্যের যোগাযোগ

উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল গন্ধার। গন্ধারের মধ্যে দিয়ে পারসিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে উপমহাদেশের যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ভাগে পারস্যের হখামনীষীয় শাসকরা গন্ধার অভিযান করেছিলেন। তাদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন প্রথম দরায়বৌষ বা দরায়ুষ (খ্রিস্টপূর্ব ৫২২-৪৮৬ অব্দ)। তাঁর শাসন গন্ধার ছাড়াও উপমহাদেশের বেশ কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর একটি লেখতে *হিদুষ* শব্দটি পাওয়া যায়। সিন্ধু নদ থেকেই ওই শব্দটি তৈরি হয়েছিল। মনে হয় যে, নিম্ন সিন্ধু এলাকা দরায়বৌষের শাসনের মধ্যে ছিল।

গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানা যায় *ইন্দুস* বা *ইন্ডিয়া* ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বা স্যাট্রাপি। দরায়বৌষ নিম্ন সিন্ধু এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর দখল কায়েম করার জন্যই ঐ অঞ্চল জয় করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ পারসিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত ছিল।

ছবি.৯.১:
নকস-ই রুস্তম-এর ছবি। এখানে পারসিক সম্রাট প্রথম দরায়বৌষের সমাধি রয়েছে

পারসিক শাসক তৃতীয় দরায়বৌষ-এর (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬-৩৩০ অব্দ) সময়ে আলেকজান্ডার পারস্য অভিযান করেন। তাতে পারসিকরা হেরে যায়। ফলে হখামনীষীয় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। গন্ধার ও নিম্ন সিন্ধু এলাকাতেও আর পারসিক অধিকার রইল না।

ছবি.৯.২: পার্সিপোলিস নগরের ধ্বংসাবশেষ

উপমহাদেশের সামান্য অংশেই পারসিক শাসন ছিল। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে তার নানারকম প্রভাব পরেও দেখা যায়। হখামনীষীয়রা প্রাদেশিক শাসক হিসেবে স্যাট্রাপদের নিয়োগ করতেন। পরবর্তী সময় শক ও কুষাণ শাসকরাও স্যাট্রাপ ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। তাদের সময় স্যাট্রাপরা হয়ে গিয়েছিল ক্ষত্রপ। তাছাড়া শাসকরা সরাসরি তাদের প্রজাদের কাছে সরকারি আদেশ-নির্দেশ প্রচার করতেন লেখর মাধ্যমে। পরে মৌর্য সম্রাট অশোক প্রায় একইভাবে সাম্রাজ্যে লেখর মাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রচার করতেন।

ভারতীয় উপমহাদেশ ও গ্রিসের যোগাযোগ

গ্রিক শাসক আলেকজান্ডার পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তার জন্যই পারসিকদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। পারসিকদের হারিয়ে আলেকজান্ডার পৌঁছে যান ভারতীয় উপমহাদেশে। উপমহাদেশে পারসিক শাসন শেষ হয় আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে। এবিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। আলেকজান্ডার বেশি দিন উপমহাদেশে ছিলেন না। ফলে ঐ অভিযানের প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশে খুব গভীরভাবে পড়েনি। আলেকজান্ডারের অভিযানের বিরুদ্ধে বেশ কিছু শাসক লড়াই করেছিলেন। আবার অনেক শাসক গ্রিক বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি আলেকজান্ডারকে সহযোগিতা করেন। তবে আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে ছোটো ছোটো শক্তিগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তার ফলেই মগধের ক্ষমতা বিস্তার সহজ হয়।

ছবি.৯.৩: আলেকজান্ডারের একটি সোনার মুদ্রার দু-পিঠ

ভারতীয় উপমহাদেশ ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ

মৌর্য শাসনের শেষ দিকেই ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বেশ কিছু বদল ঘটেছিল। পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে উপমহাদেশের রাজনীতি ও শাসন জড়িয়ে যাচ্ছিল। উপমহাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশে গ্রিক, শক-পহ্লবদের শাসন দেখা গিয়েছিল। পুষ্যমিত্র সুঙ্গের সময়েই গ্রিক রাজারা বেশ কিছু অঞ্চল দখল করেছিল। এই গ্রিক রাজাদের অনেকেই আদতে ব্যাকট্রিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছিল বাহ্লীক দেশ বা ব্যাকট্রিয়া। এটি ছিল হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ এখনকার আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে।

ছবি.৯.৪:গ্রিক শাসক সেলিউকাসের মুদ্রা

সেই ব্যাকট্রিয়া খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ দিকে গ্রিক শাসক সেলিউকাসের অধীনে ছিল। ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক রাজাদেরই *যবন* বলা হয়েছে পুরাণ সাহিত্যে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, গন্ধারের তক্ষশিলা পর্যন্ত ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক শাসন ছিল। উপমহাদেশের এই গ্রিক শাসকদের বলা হয় *ব্যাকট্রীয়-গ্রিক* বা *ইন্দো-গ্রিক* শাসক।

টুকরো কথা
মিনান্দার

ঐ সময় ইন্দো-গ্রিক রাজাদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত ছিলেন **মিনান্দার**। ব্যাকট্রিয়া এলাকায় তাঁর শাসন ছিল। প্রাচীন গন্ধার ও কান্দাহার অঞ্চলে মিনান্দারের শাসন ছিল। ব্যাকট্রিয়ার কিছু অংশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা খানিকটা তাঁর অধীনে ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে তিনি **মিলিন্দ** নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের প্রভাবে মিনান্দার বৌদ্ধ ধর্ম নেন। নাগসেনকে মিনান্দার বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। সেই কথাবার্তা **মিলিন্দপঞ্‌হো** বা **মিলিন্দপ্রশ্ন** বইতে রয়েছে। ঐ বই থেকেই জানা যায় মিনান্দারের রাজধানী ছিল সাকল বা এখনকার পাকিস্তানের শিয়ালকোট। তিনি বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগও নিয়েছিলেন।

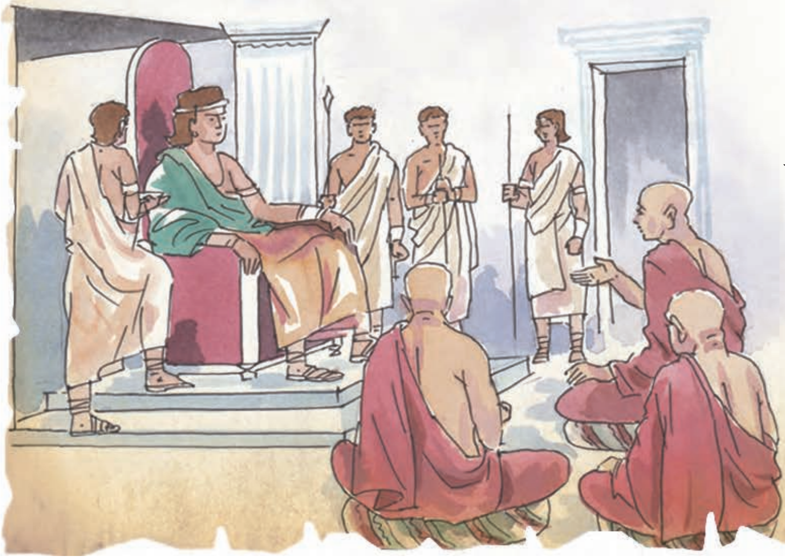

ছবি.৯.৫: গ্রিক শাসক মিনান্দারের মুদ্রা

খ্রিস্টপূর্ব ১৩০ অব্দ নাগাদ মধ্য এশিয়ার যাযাবর গোষ্ঠীর আক্রমণে ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক শাসন শেষ হয়। ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান ছিল স্কাইথীয়রা। উপমহাদেশে তারা *সেক* বা *শক* নামে পরিচিত ছিল। আর ছিল ইউয়ে-*ঝি* বা *কুষাণ*। মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে তারা ব্যাকট্রিয়ায় পৌঁছেছিল। কাশ্মীর, সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরের এলাকা ও তক্ষশিলা শকদের দখলে ছিল। অন্যদিকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের গোড়ার দিকে কাবুল এলাকা *পার্থীয়*দের হাতে চলে যায়। পার্থীয়রা ইরান থেকে উপমহাদেশে এসেছিল। পার্থীয়রাই উপমহাদেশে *পহ্লব* নামে পরিচিত ছিল।

শক শাসনের বাধা ছিল পহ্লব শাসকরা। পহ্লব রাজা গন্ডোফারনেস আনুমানিক ২০ বা ২১ খ্রিস্টাব্দে শাসন শুরু করেন। সম্ভবত শকদের হারিয়ে প্রাচীন গন্ধারের এক অংশ তিনি দখল করেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং পুরো সিন্ধু উপত্যকা গন্ডোফারনেসের অধীনে ছিল। ফলে বিরাট অঞ্চলের শাসক হিসেবে তিনিও নিজের মুদ্রায় *রাজাধিরাজ* উপাধি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর আমলে সেন্ট থমাস খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য উপমহাদেশে এসেছিলেন। কুষাণ শাসন শুরু হওয়ার ফলে শক ও পহ্লবদের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। মূলত পশ্চিম ভারত ও দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে শক শাসন টিকে ছিল।

উপমহাদেশ ও বাইরের পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগের আরেক মাধ্যম ছিল দূত বিনিময়। মূলত মৌর্য সম্রাটদের সময় থেকেই সেই দূত বিনিময় শুরু হয়েছিল। সেই দূতেরা অনেকেই তাঁদের অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছিলেন।

গ্রিক শাসক সেলিউকাসের দূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় গিয়েছিলেন। ঐ একই সময়েই সেলিউকাসের দূত হয়ে মৌর্য দরবারে গিয়েছিলেন ডায়ামাকাস। মিশরের শাসক টলেমি ডায়োনিসিয়াসকে পাঠিয়েছিলেন দূত হিসেবে মৌর্যদের কাছে। মৌর্য সম্রাটরাও তাঁদের দূত পাঠাতেন বিদেশি শাসকদের সভায়।

বিন্দুসারের সঙ্গে সিরিয়ার শাসক প্রথম অ্যান্টিওকস-এর যোগাযোগ ছিল। বিন্দুসার নাকি গ্রিক রাজার কাছে কয়েকটি জিনিস ও একজন পণ্ডিত চেয়েছিলেন। সিরিয়ার শাসক সব জিনিস পাঠালেও পণ্ডিত পাঠাননি। এই ঘটনা কতটা বাস্তব তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে বোঝা যায় পশ্চিম এশিয়ার গ্রিকদের সঙ্গে মৌর্যরা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল।

সম্রাট অশোক উপমহাদেশের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, সিংহল প্রভৃতি জায়গায় অশোক দূত পাঠিয়েছিলেন। রাজগৃহে পাওয়া একটি লেখ থেকে হর্ষবর্ধনের সময় চিনের সঙ্গে দূত বিনিময়ের বিষয়ে জানা যায়।

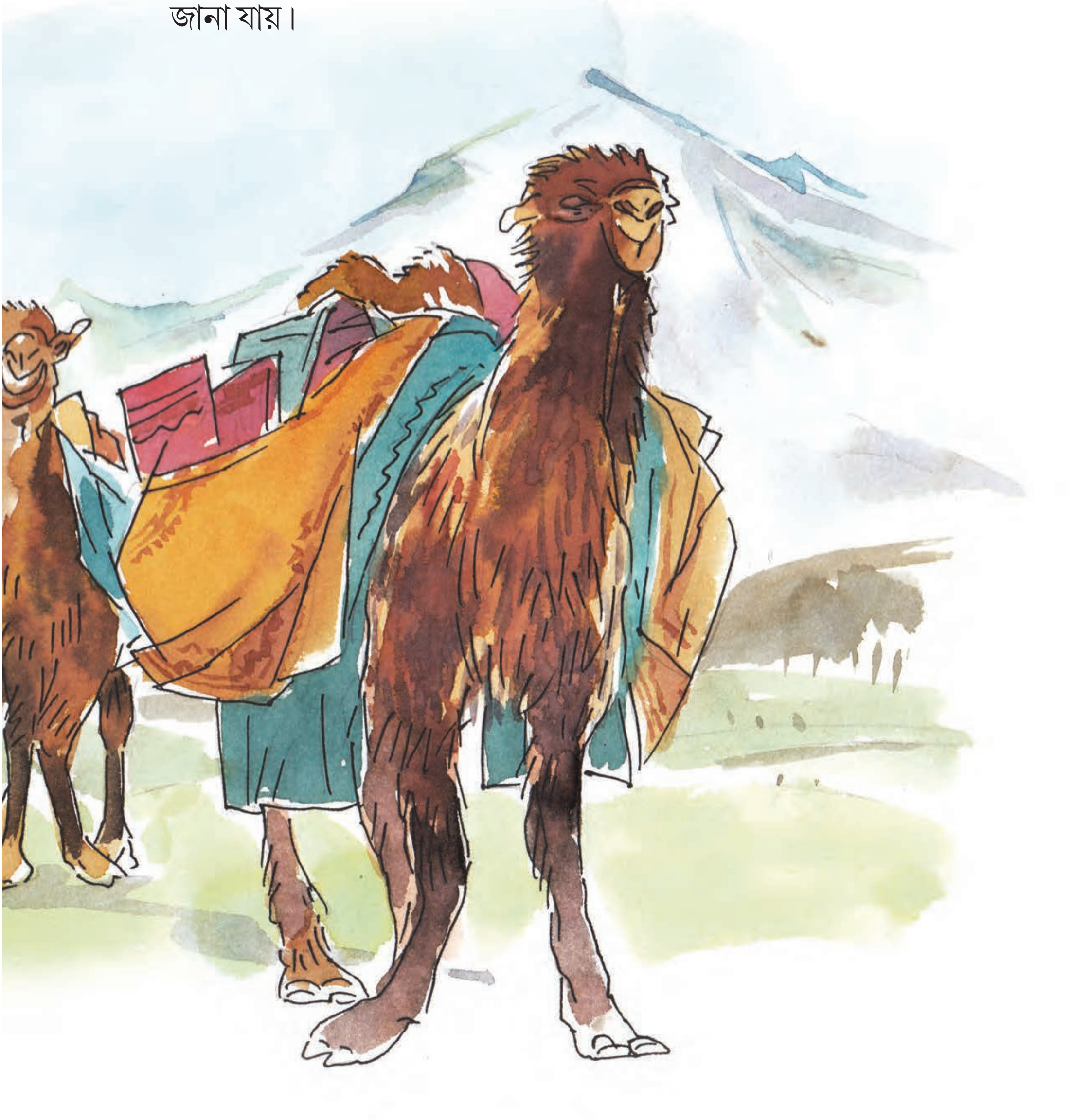

টুকরো কথা

হূণ আক্রমণ

আনুমানিক ৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে হূণরা ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান করেছিল। তখন স্কন্দগুপ্তের শাসন-কাল। তিনি হূণ অভিযানকে সফলভাবে আটকে দিতে পেরে-ছিলেন। তারপর অনেক দিন হূণ অভিযান উপমহাদেশে হয়নি। পঞ্চম শতকের শেষ ও ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় হূণরা আবার শক্তিশালী হয়। সেসময় তাদের নেতা ছিলেন তোরমান এবং মিহিরকুল। উপমহাদেশের কিছু অঞ্চলে তোরমানের শাসন ছিল। তোরমানের ছেলে মিহিরকুল (৫২০ - ৫৩৫ খ্রি.) ছিলেন ক্ষমতাবান শাসক। হূণরা গুপ্ত শাসনের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হূণশাসনের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার স্থল-বাণিজ্যে ভাটা দেখা দেয়।

মনে রেখো

শক শাসক প্রথম অয় একটি অব্দ চালু করেছিলেন। সেই অব্দটি **অয়অব্দ** এবং **বিক্রমাব্দ** দুই নামেই পরিচিত। কান্দাহার থেকে উত্তর -পশ্চিম সীমান্তের এলাকায় প্রথম অয়-র অধিকার ছিল। আস্তে আস্তে শক শাসন উত্তর ভারতে এবং গঙ্গা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

৯.১.২ অর্থনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে উপমহাদেশের সঙ্গে বাইরের দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টীয় ৩০০ অব্দের মধ্যে সেই বাণিজ্যিক যোগাযোগ সবথেকে বেড়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের লেনদেন চলত। জলপথ ও স্থলপথে ঐ যোগাযোগ হতো। রোম সাম্রাজ্যে ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে চিন ও ভারতের নানা জিনিসের চাহিদা ছিল। এদের মধ্যে সবথেকে বেশি কদর ছিল চিনা রেশমের। তাকলামাকান মরুভূমিকে এড়িয়ে দুটি পথে চিনা রেশম নিয়ে যাওয়া হতো। ঐ পথদুটি কাশগড়ে গিয়ে মিশত। সেখান থেকে বিভিন্ন পথ পেরিয়ে রেশম পৌঁছে যেত ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের এলাকায়। রেশম ছিল ঐ স্থলপথগুলির প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। তবে সেইসময়ে *রেশম পথ* বলে কোনো নাম ছিল না। অনেক পরে খ্রিস্টীয় উনিশ শতকে ঐ পথকে রেশম পথ বলা হতো। এই বিরাট অঞ্চলের কিছু অংশ এক সময় পার্থীয়দের দখলে ছিল। পরে কুষাণরা ব্যাকট্রিয়া দখল করেন। তার ফলে রেশম পথের একটি শাখা দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। রেশম বাণিজ্য থেকে কুষাণ শাসকরা অনেক শুল্ক আদায় করতেন। ঐ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ উপমহাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে জড়ো হতেন।

ছবি. ৯.৬:
ইউমেন পাস, গোবি মরুভূমি অঞ্চলে রেশম পথের একটি শুল্ক কেন্দ্র।

টুকরো কথা
পেরিপ্লাস ও মৌসুমি বায়ু

ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরকে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান ভূগোলে **ইরিথ্রিয়ান সাগর** বলা হতো। সেই ইরিথ্রিয়ান সাগরে যাতায়াত ও বাণিজ্য বিষয়ে একটি বই লেখা হয়েছিল। তার নাম ***পেরিপ্লাস অভ দ্য ইরিথ্রিয়ান সী***। পেরিপ্লাস কথাটার দুটো মানে হয়। জলযানে করে ঘুরে বেড়ানো। আবার জলপথে যাতায়াতের বর্ণনা। সেভাবে ধরলে বইটির নামের বাংলা মানে হতে পারে ইরিথ্রিয়ান সাগরে ভ্রমণ। বইটির লেখকের নাম জানা যায় না। বইটি গ্রিক ভাষায় লেখা। বইটির লেখক একজন গ্রিক, যিনি মিশরে থাকতেন।

বইটি লেখক নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছিলেন। তাই বইটিতে ইরিথ্রিয়ান সাগরের বন্দর ও ব্যবসাবাণিজ্যের নানা বিষয়ে খুঁটিনাটি বর্ণনা রয়েছে। বণিকদের সুবিধার জন্য লেখা হয়েছিল বইটি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে মাঝামাঝি সময়ে বইটি লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়। তার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষজন, সমাজ, গাছপালা, পশু-পাখি বিষয়েও নানা কথা। এই বইটি খ্রিস্টীয় প্রথম শতক নাগাদ অর্থনীতির ইতিহাস জানার জরুরি সাহিত্যিক উপাদান।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বিষয়ে আরো বেশি ধারণা তৈরি হয়। ঐ বায়ুর সাহায্যে ইরিথ্রিয়ান সাগরে যাতায়াত ও বাণিজ্য সহজ হয়েছিল।

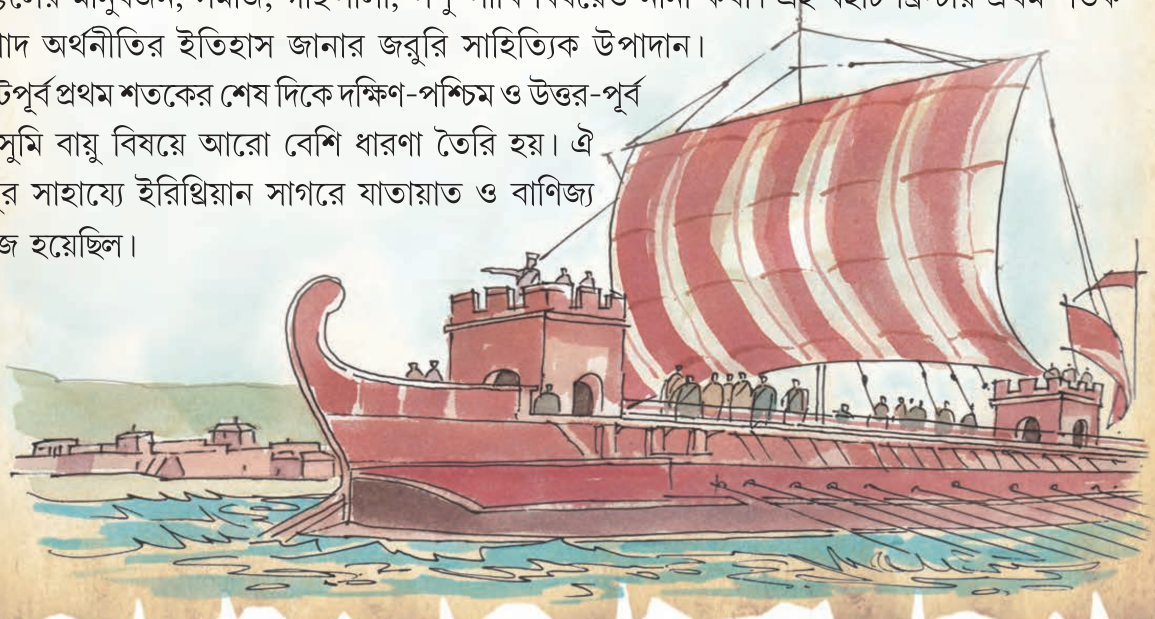

সমুদ্র বাণিজ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের দুই উপকূলের বন্দরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির সঙ্গে রোমের বাণিজ্য চলত। পশ্চিম উপকূলের সেরা বন্দর ছিল নর্মদা নদীর মোহনায় ভৃগুকচ্ছ। উত্তরের কোঙ্কন উপকূলে বেশ কয়েকটি বন্দর ছিল। তার মধ্যে বিখ্যাত ছিল কল্যাণ বন্দর। শক শাসক নহপান ঐ বন্দরটি অবরোধ করেছিলেন। মালাবার উপকূলের বন্দরগুলি দিয়ে গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলার বাণিজ্য চলত। এখনকার তামিলনাড়ু উপকূলেও ছিল বেশ কিছু বন্দর। কাবেরী ব-দ্বীপ এলাকায় বিখ্যাত বন্দর ছিল কাবেরীপট্টিনম। অন্ধ্র উপকূলেও কয়েকটি বন্দরের কথা জানা যায়। সেখানে সম্ভবত জাহাজ ছাড়ার জায়গাও ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পুরো পূর্ব উপকূলের গুরুত্ব ছিল।

???
ভেবে দেখো

এই পুরো বই জুড়ে প্রাচীন বাংলার কোন কোন অঞ্চলের নাম রয়েছে তার একটা তালিকা বানাও। ঐ অঞ্চলগুলি কী কী কারণে বিখ্যাত ছিল?

টুকরো কথা

বন্দর-নগর : তাম্রলিপ্ত

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের একটি পরিচিত বন্দর-নগর ছিল তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্তি, দামলিপ্ত প্রভৃতি নামেও এই নগরের পরিচয় দেওয়া হতো। বিদেশি লেখকদের বর্ণনায় তামালিতেস (গ্রিক) নামও পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত এই সামুদ্রিক বন্দরের কাজকর্ম জারি ছিল। সুয়ান জাং বলেছেন, তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের একটি খাঁড়ির উপরে রয়েছে। সেখানে স্থলপথ ও জলপথ এসে মিশেছে। সম্ভবত, সেটি ছিল এখনকার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের কাছাকাছি। ঐ বন্দর থেকেই ফাসিয়ান জাহাজে উঠেছিলেন। স্থলপথেও তাম্রলিপ্ত যাতায়াত করা সহজ ছিল। বাণিজ্য ছাড়া তাম্রলিপ্ত নগর পড়াশোনার কারণেও বিখ্যাত ছিল। তবে নদীখাত শুকিয়ে যাওয়ার ফলে বন্দর-নগরটির গুরুত্ব কমতে থাকে। নগর হিসাবেও তার খ্যাতি নষ্ট হয়।

৯.১.৩ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম

উপমহাদেশের সঙ্গে বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগের আরেক মাধ্যম ছিল সাংস্কৃতিক বিনিময়। বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মেলামেশার মাধ্যমে ঐ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হতো। এর ফলে উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে নানা বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি ঐ জাতি-উপজাতিগুলির অনেকে মিশে গিয়েছিল উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে।

পারসিক সাম্রাজ্যের অধীন এলাকাগুলিতে আরামীয় ভাষা ও লিপি চলত। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে ঐ ভাষা ও লিপি ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকও ঐ অঞ্চলে আরামীয় ভাষা ও লিপি ব্যবহার করেন। ঐ আরামীয় লিপি থেকে সম্ভবত খরোষ্ঠী লিপি তৈরি হয়েছিল। দুটি লিপিই ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে লেখা হতো। পারসিক শাসকরা উঁচু পাথরের স্তম্ভ বানাতেন। সম্ভবত তার প্রভাব পড়েছিল মৌর্য শাসকদের উঁচু পাথরের স্তম্ভ বানানোর ভাবনায়। আলেকজান্ডার পারসিক সাম্রাজ্যের পার্সিপোলিস নগরী ধ্বংস করে দেন। তার ফলে পারসিক শিল্পীরা অনেকেই উপমহাদেশে চলে আসতে বাধ্য হন। ঐ শিল্পীদের হাতে ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য শিল্প শুরু হয়েছিল।

আলেকজান্ডার ভারতীয় উপমহাদেশে কয়েকটি নগর তৈরি করেছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়ও সেই নগরগুলি ছিল। সেগুলিতে গ্রিকরা থাকত। ধীরে

ধীরে ঐ গ্রিকরা উপমহাদেশের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায়। তারা বৌদ্ধধর্মের চর্চাও করতে থাকে। অন্যদিকে গ্রিকদের থেকে নতুন ধরনের মুদ্রা তৈরি করতে শিখেছিল উপমহাদেশের মানুষ। ইন্দো-গ্রিকরা উপমহাদেশে সোনার মুদ্রা চালু করেন। বিজ্ঞান বিশেষত গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গ্রিক ও ভারতীয় ভাবনাচিন্তার বিনিময় দেখা যায়। তাছাড়া ঐ সময় গ্রিক প্রভাবিত শিল্পের চর্চাও শুরু হয়েছিল। যার অন্যতম উদাহরণ হলো গন্ধার শিল্প।

টুকরো কথা
গন্ধার শিল্প

গন্ধার প্রদেশে নানা কারণে বিভিন্ন জাতির মেলামেশার সুযোগ ছিল। সেই মেলামেশার ছাপ ঐ অঞ্চলের শিল্পেও পড়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মকে ঘিরে গন্ধার শিল্প গড়ে উঠেছিল। আগে বুদ্ধের মূর্তি বানানো ও পুজো করা নিষিদ্ধ ছিল। গন্ধারের শিল্পীরা নতুন ধরনের বুদ্ধ মূর্তি তৈরি করেন। নাক টিকালো, টানা ভুরু ও আধবোজা চোখ মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্য। মূর্তির পায়ের জুতোগুলিও রোমান জুতোর মতো দেখতে হতো। সোনালি রংয়ের ব্যবহারও মূর্তিগুলিতে দেখা যায়। সবমিলিয়ে গন্ধার শিল্পে গ্রিক ও রোমান শিল্পের ছাপ দেখা যায়। যদিও গন্ধার মূর্তিগুলির পিছনে ভাবনাচিন্তা ছিল ভারতীয় রীতির। পাশাপাশি ইরানীয় ও মধ্য এশীয় শিল্পের ছাপও গন্ধার শিল্পে পড়েছিল। গন্ধার অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থার কারণে নানান শিল্পের প্রভাব সেখানে মিলেমিশে গিয়েছিল।

ছবি. ৯.৭: গৌতম বুদ্ধ, গন্ধার শৈলী

শক শাসকরা নানারকম রুপোর মুদ্রা চালু করেন। কয়েকটি মুদ্রায় গ্রিক ও প্রাকৃত দুই লিপিতেই লেখা হতো। শক শাসক মোগ নিজের মুদ্রায় *রাজাতিরাজ* উপাধিও ব্যবহার করেন। এই উপাধিটি খেয়াল রাখা দরকার। *রাজাধিরাজ* থেকেই উপাধিটি এসেছে। শক শাসক রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রশস্তি সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম বড়ো লেখ। তার আগে সব লেখই প্রাকৃত ভাষায় রচিত।

শক-পহ্লব ও কুষাণদের জীবনযাপনের নানা উপাদান উপমহাদেশের জীবনযাপনে ছাপ ফেলেছিল। আবার তারাও উপমহাদেশের সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম থেকে অনেক কিছু নিয়েছিল। যুদ্ধরীতি, পোশাক, ঘর-বাড়ি ও সংস্কৃতির নানা কিছুতেই সেই বিনিময়ের নজির আছে।

শক-পহ্লবরা যুদ্ধে ঘোড়ার ব্যবহারকে উন্নত করেছিল। পহ্লবরা চলন্ত ঘোড়ায় বসে পিছনে ঘুরে তির ছোঁড়ার কায়দা চালু করে। উপমহাদেশে ঘোড়ার

লাগাম ও জিনের ব্যবহার শুরু করেছিল শক-পহ্লবরা। কুষাণরাও ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে খুব পটু ছিল।

শক-কুষাণরা উপমহাদেশে নানারকম পোশাক চালু করেছিল। যেমন, জামা, পাজামা, লম্বা জোব্বা, বেল্ট, জুতো প্রভৃতি। শক ও কুষাণ আমলে নগরের পাঁচিলগুলি তৈরি হতো ইট দিয়ে। তাছাড়া একধরনের লাল মাটির পাত্র কুষাণ আমলে বানানো হতো। ঐ মাটির পাত্র বানাবার পদ্ধতি মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশে এসেছিল।

মধ্য এশিয়া থেকে আসা এইসব শাসকরা অনেকেই বিষ্ণুর উপাসক হয়ে পড়েন। আবার অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কুষাণরা শিব, বিষ্ণু ও বুদ্ধের উপাসনা করেছিলেন। কুষাণদের মুদ্রায় গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত ছিল। আগে গৌতমবুদ্ধের কোনো মূর্তি পুজো হতো না। বুদ্ধের কোনো প্রতীক বা চিহ্নকে সামনে রেখে পুজো করা হতো।

উপমহাদেশের নাটকের চর্চার উপরেও গ্রিক প্রভাব পড়েছিল। নাটকের মঞ্চ বানানো, পর্দার ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেই প্রভাব দেখা গিয়েছিল। নাটকের পর্দাকে সংস্কৃতে *যবনিকা* বলা হয়। গ্রিকরাই এই পর্দা ফেলার প্রথা চালু করেছিল। তাদের *যবন* নাম থেকেই *যবনিকা* শব্দটি তৈরি হয়েছিল। সাহিত্যচর্চার প্রতিও এই শাসকদের অনেকে উৎসাহী ছিলেন।

ধীরে ধীরে এইসব বিদেশি জাতি-উপজাতিগুলি উপমহাদেশের সমাজে মিশে গিয়েছিল। তাদের ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধৃশ্রেণি বলে মনে করা হতো। তবে ব্রাহ্মণদের চোখে তারা ছিল নীচু শ্রেণির ক্ষত্রিয়।

বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগের আরেকটি মাধ্যম ছিল। অনেক পণ্ডিত শিক্ষক উপমহাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে যেতেন, শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা করতে বাইরে থেকে শিক্ষার্থীরাও আসতেন। ঐসব দেশের মধ্যে চিন দেশে বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা সবথেকে জনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে চিন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার বেড়েছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশের কাশ্মীর অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা হতো। বুদ্ধযশ ছিলেন তেমনই একজন কাশ্মীরি বৌদ্ধ পণ্ডিত। পড়াশোনা শেষে তিনি মধ্য এশিয়ার কাশগড়ে চলে যান। কুমারজীবের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। পণ্ডিত পরমার্থও চিনে গিয়েছিলেন পড়াশোনার কারণে। অনেক বৌদ্ধ সাহিত্য সঙ্গে নিয়ে ৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিনে পৌঁছোন। বাকি জীবন সেখানেই থেকে বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষাচর্চা করেন।

টুকরো কথা

জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চায় বিনিময়

ভারতীয়, গ্রিক, ব্যাবিলন ও রোমান জ্যোতি-র্বিজ্ঞান চর্চা একে অন্যের উপর প্রভাব ফেলেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার একটি বিখ্যাত বই ছিল **যবনজাতক**। বইটি আদতে গ্রিক ভাষায় লেখা। আনুমানিক ১৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সেটি সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়। তাই তার নামে যবন কথাটা পাওয়া যায়। এর থেকে গ্রিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানের দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টা বোঝা যায়। বরাহমিহিরের **পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা** বইটিতেও সেই প্রভাবের নজির রয়েছে। সেখানে বরাহমিহির জ্যোতি-র্বিজ্ঞান বিষয়ে **পৌলিশ** ও **রোমক** সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করেছেন। পৌলিশ সিদ্ধান্তটি গ্রিস ও রোমক সিদ্ধান্তটি রোম থেকে এসেছিল।

টুকরো কথা
কুমারজীব

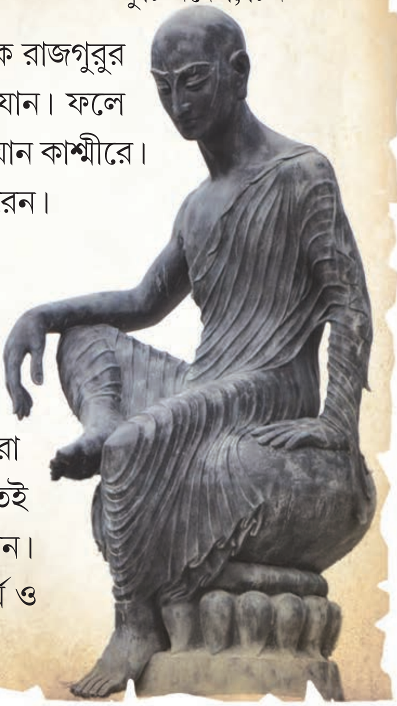

ছবি. ৯.৮:
কুমারজীবের মূর্তি, কিজিল গুহা, কুচি প্রদেশ, চিন

কুমারজীবের বাবা কুমারাযান কুচিতে চলে গিয়েছিলেন। কুচির রাজা তাঁকে রাজগুরুর পদ দিয়েছিলেন। কুমারজীবের জন্মের পরে তাঁর মা জীব বৌদ্ধ হয়ে যান। ফলে ন-বছরের কুমারজীব (৩৪৩ খ্রিস্টাব্দ- ৪১৩ খ্রিস্টাব্দ) মায়ের সঙ্গে চলে যান কাশ্মীরে। সেখানে বন্ধুদত্তের কাছে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা করেন। পড়াশোনা শেষে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরেন কুমারজীব। ততদিনে পণ্ডিত হিসেবে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। কিছু দিন পরে চিনের শাসক কুচি আক্রমণ করেন। কুমারজীব তখন কুচিতে ছিলেন। ৩৮৩ খ্রিস্টাব্দে কুমারজীবকে কুচি থেকে কান-সু প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। চিন সম্রাটের অনুরোধে ৪০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিনের রাজধানীতে যান। পরবর্তী এগারো বছর কুমারজীব চিনের রাজধানীতেই ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পড়াশোনাতেই তাঁর জীবন কেটেছিল। সংস্কৃত ও চিনা দু-ভাষাতেই কুমারজীব দক্ষ ছিলেন। ফলে অনুবাদের কাজ খুব সহজেই তিনি করতে পারতেন। চিনে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারের ক্ষেত্রে কুমারজীবের ভূমিকা বিখ্যাত।

ভারত থেকে চিনে শিক্ষকদের যাতায়াতের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে চিনের উৎসাহ তৈরি হয়। সেই উৎসাহের ফলেই চিন থেকে বেশ কিছু মানুষ ভারতে আসতে থাকেন। তাঁরা ভারতে পড়াশোনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রগুলি ঘুরেও দেখেছিলেন। তাও-নান নামের এক চিনা পণ্ডিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভারতে আসার উৎসাহ দিয়েছিলেন। তার রেশ ধরেই ভারতে এসেছিলেন ফাসিয়ান। ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে পাঁচজন সহসন্ন্যাসী সমেত ফাসিয়ান ভারতে পৌঁছোন। তিনি কাশ্মীর হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন। পরে উত্তর ভারতের বহু অঞ্চল ঘুরে দেখেছিলেন তিনি। তিন বছর পাটলিপুত্রে থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা করেছিলেন ফাসিয়ান। দু-বছর তিনি তাম্রলিপ্ততেও ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা *ফো-কুয়ো-কি* বইতে তিনি লিখেছিলেন। দেশে ফেরার সময় ভারত ও সিংহল থেকে অনেক বৌদ্ধপুঁথি নিয়ে গিয়েছিলেন ফাসিয়ান।

ফাসিয়ানের পরে আরও অনেক পণ্ডিতই চিন থেকে উপমহাদেশে পড়াশোনার জন্য এসেছিলেন। তাঁরা অনেকেই নালন্দা মহাবিহারে থেকে পড়াশোনা করতেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিষয়েও চর্চা হতো। তাছাড়া বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ও শিক্ষা নিতেন তাঁরা।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে প্রথম দিকে চিন থেকে উপমহাদেশে এসেছিলেন সুয়ান জাং। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি উপমহাদেশে পৌঁছোন। হর্ষবর্ধন তখন কনৌজ শাসন করছিলেন। পরবর্তী চোদ্দো বছর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান সুয়ান জাং। নালন্দা মহাবিহারে পণ্ডিত শীলভদ্রের কাছে পড়াশোনা করেন তিনি।

মানচিত্র ৯.২ :

ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং-এর ভারতীয় উপমহাদেশে ভ্রমণ পথ

ভেবে দেখো　　　　খুঁজে দেখো

১। **বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো :**

১.১) ভৃগুকচ্ছ, কল্যাণ, সোপারা, তাম্রলিপ্ত।

১.২) বুদ্ধযশ, কুমারজীব, পরমার্থ, সুয়ান জাং।

১.৩) আলেকজান্ডার, সেলিউকাস, কনিষ্ক, মিনান্দার।

২। **ক-স্তম্ভের সঙ্গে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :**

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
নকস-ই রুস্তম	সিরিয়া
ভৃগুকচ্ছ	প্রথম দরায়বৌষ
প্রথম অ্যান্টিওকস	নর্মদা নদী

৩। **সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১) হেরোডোটাসের মতে ইন্দুস ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের একটি — (প্রদেশ /দেশ/ জেলা)।

৩.২) ইন্দো-গ্রিক বলা হতো — (শকদের/ব্যাকট্রিয়ার অধিবাসীদের/ কুষাণদের)।

৩.৩) সেন্ট থমাস খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন — (আলেকজান্ডার/ মিনান্দার/ গন্ডোফারনেস)-এর আমলে।

৪। **নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :**

৪.১) আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযানের কি মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার উপরে কোনো প্রভাব ছিল?

৪.২) শক-কুষাণরা আসার আগে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কী কী বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

৪.৩) প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পড়াশোনার কী ভূমিকা ছিল বলে তোমার মনে হয়?

৫। **হাতেকলমে করো :**

৫.১) নবম অধ্যায়ের মুদ্রার ছবিগুলির সঙ্গে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের মুদ্রার ছবিগুলির মিল ও অমিলগুলি খুঁজে বার করো।

৫.২) ৯.২ মানচিত্রটি ভালো করে দেখো। ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলেন? কোন কোন জায়গায় দুজনেই গিয়েছিলেন? তার একটি তালিকা তৈরি করো।

তোমার পাতা

ইতিহাস পড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা কেমন হলো? কতটা আনন্দ, কতটা মজা পেলে সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা জেনে? আর কী কী থাকলে আরো মজায় ও আনন্দে ইতিহাস জানা যেত? তোমার সেসব ভাবনা এই পাতাটায় লিখে রাখো বছর শেষে ....

শিখন পরামর্শ

- পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির ষষ্ঠ শ্রেণিতে পৃথক বিষয় হিসাবে ইতিহাসচর্চা শুরু হবে। সেই মতো পঠন-পাঠনের জন্য *অতীত ও ঐতিহ্য* বইটি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা হলো।
- ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৫)-র নির্দেশ অনুযায়ী এই বইয়ের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ ভাষায়, ছবি, তালিকা এবং মানচিত্রের সাহায্যে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের (প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) নানা দিক এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।
- এই বইটি ন-টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে নবম অধ্যায়ের দিকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে। অথবা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্যভাবেও অধ্যায়গুলি সাজিয়ে নিতে পারে। বইতে মূল উচ্চারণের দিকে নজর রেখে নানা স্থান ও ব্যক্তিনাম এবং সিন্ধু নদের পাঁচটি নদীর নাম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত অন্য নামগুলিও বলা যেতে পারে যেমন:

  ক) ইন্দাস / সিন্ধু, ঝিলাম/ বিতস্তা, চেনাব/ চন্দ্রভাগা, সাটলেজ/ শতদ্রু, রাভি/ ইরাবতী, বিয়াস/ বিপাশা। খ) মূল চিনা ভাষার উচ্চারণ বজায় রেখে নিম্নোক্ত নামগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন-ফা হিয়েন /ফাসিয়ান, হিউয়েন সাঙ/সুয়ান জাং। গ) ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য প্রাক্, ঋক্ প্রভৃতি শব্দে হসন্ত (্) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি।
- বইয়ের মূল ধারাবিবরণীর পাশাপাশি ৮৫টি 'টুকরো কথা' শীর্ষক অংশে আলাদা করে নানা বৈচিত্র্যময় বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এসবই আগ্রহী শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি আরো আকৃষ্ট করার জন্য রাখা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারবেন, তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করতে পারবেন। তবে নিরন্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলিকে পরিহার করে চলাই ভালো। এই অংশগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যাবে না। শ্রেণিকক্ষে কল্পনাধর্মী ও তুলনামূলক আলোচনায় সেগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। এর মধ্যে ২১, ৩৯, ৫২, ৫৬, ৭৪, ৯২, ১০৮, ১১২, ১২১ এবং ১৪৪ পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা' অংশগুলিকে ব্যতিক্রমী বলে ধরতে হবে। এগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে।
- এই বইটির ছবিগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ছবি নয়। ছবিকে সব সময়েই বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। ছবিগুলি মূল পাঠ্যবিষয়বস্তুরই অঙ্গ।
- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি দিয়ে এক-একটি যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে।
- ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাল-তারিখ। সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের (প্রথম অধ্যায়ে) প্রাথমিক কিন্তু বিস্তারিত ও সহজবোধ্য ধারণা দেওয়া হয়েছে। বইটিতে শিক্ষার্থীদের নীরস ভাবে সাল-তারিখ মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া হয়নি। রাজা-রাজড়াদের নামের তালিকা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করবে এমন কোনো দাবিও আমাদের নেই। সাধারণভাবে শাসকবংশগুলির বিশদ এবং ধারাবাহিক ইতিহাসের

বিবরণ এখানে বাদ রাখা হয়েছে। তবে কালানুসারে ইতিহাসের পরিবর্তনের একটি ধারণা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে তার জন্য কোনো একটি কালপর্বের মূল দিকগুলিকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- অনেক পাতার এক পাশে শিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা রইল। পাঠ্যবিষয়ে তাদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা তারা সেখানে লিখে রাখবে। আশা রইল প্রথম দিনেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করে দেবেন।
- দ্বিতীয় অধ্যায়ে *আদিম মানুষের নানারকম* শীর্ষক টুকরো কথায় মানুষের বিবর্তনের চারটি মূল পর্বের কথা বলা হয়েছে। যদিও ঐ পর্বগুলির মধ্যে মধ্যে আরও অনেকগুলি পর্ব রয়েছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকারা সেই পর্বগুলিও সহজ সাবলীলভাবে তুলে ধরতে পারেন।
- প্রয়োজনবোধে বিদ্যালয়ের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে/শ্রেণিকক্ষে ইতিহাসের মানচিত্র, চার্ট ও তালিকা, মডেল, ছবি সংগ্রহ করে সেসব নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরও বিভিন্ন সূত্র থেকে ছবি সংগ্রহ/বিবরণ প্রদর্শনে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের মনে স্থাপত্য-ভাস্কর্য-শিল্প সম্পর্কে উৎসাহ তৈরির জন্য স্থানীয় ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নস্থল এবং প্রয়োজন বোধে সংগ্রহালয় (মিউজিয়ম) প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।
- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা করা যেতে পারে।
- পঠন-পাঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বছরভর নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE)। এর জন্য প্রয়োজন নানা রকমের কৃত্যালি ও অভিনব তথা সৃজনশীল প্রশ্নের চয়ন। অধ্যায়ের ভিতরে **ভেবে বলো** শীর্ষক এবং অধ্যায়ের শেষে **ভেবে দেখো খুঁজে দেখো**-র অন্তর্গত **হাতেকলমে** শীর্ষক কৃত্যালিগুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে নমুনা অনুশীলনী **'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো'** দেওয়া আছে, তার আদলে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ নিজেরাই প্রশ্নসম্ভার তৈরি করে নিতে পারবেন। এই অনুশীলনীগুলি সেই কাজে দিক নির্দেশ করছে মাত্র। মানচিত্র এবং ছবি দিয়েই সরাসরি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের সামনে। প্রথম অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন অনুশীলনীতে রাখা হয়নি। মূল্যায়নের সময় এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন রাখা যাবে না। শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানের সূত্র ধরে অতীতের কোনো বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে।
- নীচে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা পাঠ্যসূচি দেওয়া হলো। প্রয়োজনে এই পাঠ্যসূচি শিক্ষক/শিক্ষিকারা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাপেক্ষে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতিটি পর্বের মধ্যে পাঠ্যবিষয় শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকে ধরে পর্ব বিভাজন করা হয়েছে : প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়/দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়/তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: অষ্টম ও নবম অধ্যায়/(**এক্ষেত্রে পূর্বের পর্যায়ক্রমিক শিখন সামর্থ্যকে পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে**)। (**বি.দ্র.:** ১। প্রথম অধ্যায় থেকে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে কোনো প্রশ্ন রাখা যাবে না। ২। সপ্তম অধ্যায়টির শিখন-শিক্ষণ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যে করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে করতে হবে।